সোনার হরফে লেখা অনন্য শিক্ষকের নাম

মাহরুফ চৌধুরী

: সোমবার, ২৮ জুলাই ২০২৫

আজ যখন আমরা শোকাহত অকালে ঝরে যাওয়া মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কচিপ্রাণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মাহরিন চৌধুরীর নির্মম প্রয়াণে স্তব্ধ, তখন এই মুহূর্তটি কেবল বেদনার নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে গভীর শ্রদ্ধা, অনন্ত কৃতজ্ঞতা এবং এক অনিবার্য দায়বোধের আহ্বান। স্বপ্নেবিভোর কৈশোরে, অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য হিসেবে ইব্রাহিম খাঁর (১৮৯৪-১৯৭৮) ‘ভাঙা কুলো’ গল্পের অংশ বিশেষ পড়েছিলাম ‘সোনার হরফে লেখা নাম’ শিরোনামে। ভাষা আন্দোলনের আবহে রচিত সেই গল্পটির শেষ লাইন দুটি আজও মনের গহীনে গেঁথে আছে। গল্পের আত্মত্যাগী নায়ক ‘বড় মিঞা’র মৃত্যুতে কথকের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল এক অসামান্য পঙক্তি: ‘দুনিয়ার দফতরে যারা মানুষের নাম লিখে রাখে, তাদের নজরে তুমি পড়বে না জানি। কিন্তু আলেমুল গায়েব যদি কেউ থেকে থাকে, তবে তার দফতরে তোমার কীর্তি নিশ্চয়ই সোনার হরফে লেখা হয়ে থাকবে’। এই বাক্য দুটি যেন আজ সেই গল্পের শব্দের সীমা অতিক্রম করে এক জীবন্ত সত্য হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাহরিন চৌধুরীর প্রসঙ্গে। আমাদের প্রতিদিনের নিষ্প্রভ জীবনচর্যায় ইতিহাসচর্চা যখন বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে ভুলে থাকতে শেখায়, তখন তার মতো একজন আত্মপ্রত্যয়ী দুঃসাহসী শিক্ষক আমাদের মনে করিয়ে দেন, কিছু কিছু নাম সরকারি দফতরের খাতায় না উঠলেও মানবতার অন্তর্লিখিত ইতিহাসে ও সমসাময়িক মানুষের স্মৃতিতে চিরন্তন হয়ে থাকেন, সোনার হরফে লেখা হয়ে থাকে তাদের নাম।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯) এক গভীর উপলব্ধি থেকে বলেছিলেন, ‘যে দেশে গুণীর কদর নেই, সে দেশে গুণী জন্মায় না’। এই কথাটি নিছক কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ নয়; বরং আমাদের জাতিগত মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক দৈন্যতার এক নির্মম প্রতিবিম্ব। আজ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে অযোগ্যতা, সুবিধাবাদিতা আর দুবৃত্তায়ণই যেন হয়ে উঠেছে সাফল্যের মানদ-। অথচ আত্মনিবেদিত, সৎ ও আদর্শবান মানুষদের কণামাত্র স্বীকৃতিও দেওয়া হয় না। তারা নীরবে হারিয়ে যান বিস্মৃতির অতলে। মাহরিন চৌধুরীর মতো নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের আত্মত্যাগ তাই কেবল একটি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার নয়। বরং তা দেশের জন্য এক গভীর নৈতিক চ্যালেঞ্জ, যা একটি জাতিকে তার বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে গেছেন, আমরা কি সত্যিই গুণীজনদের মূল্য দিতে জানি? আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে, সামাজিক আচরণে ও সাংস্কৃতিক চর্চায় কি তাদের যথার্থ স্থান রয়েছে? মাহরিনের মতো মানুষের আত্মদান তাই কেবল শোক নয় তা আমাদের দায়বদ্ধতার মানদ-, যা নির্ধারণ করে দেয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অবস্থান। যদি সমাজ ও রাষ্ট্র বারবারই গুণীজনের অবমূল্যায়নে নিমজ্জিত থাকে, তবে একদিন হয়তো সত্যি সত্যিই এই দেশ জ্ঞান, আদর্শ, নীতি ও মানবিকতার মরুভূমিতে পরিণত হবে।

নিঃসন্দেহে মাহরিন চৌধুরী এক অবিস্মরণীয় মুখ, এক মহৎ ব্যক্তিত্ব ও অনন্য শিক্ষক। ২০২৫ সালের ২১ জুলাইয়ের সেই তপ্ত দুপুরে দগ্ধ হওয়া মাইলস্টোনের বিভীষিকাময় মৃত্যুপুরীতে মায়ের মমতায় ও শিক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে নিজের জীবনকে বাজী রেখেছিলেন তিনি। আগুনের লেলিহান শিখা যখন গ্রাস করছিল ভবনভর্তি কোমলমতি শিশুদের অনাগত দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে, তখন যেন হতবিহ্বল সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্কে যখন চারপাশ এলোমেলো, সবাই যখন নিজ নিজ জীবন বাঁচাতে ছুটছে, তখন সেই মুহূর্তে এক ‘মা’ শিক্ষক আগুনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তার ‘বাচ্চা’ শিক্ষার্থীদের রক্ষায়। মাহরিন চৌধুরী কেবল একজন শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি শিক্ষকতার অন্তর্নিহিত অর্থকে জীবন দিয়ে অর্থবহ করে গেছেন। আগুনের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি একে একে বিশের অধিক আটকে পড়া

শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেই আটকা পড়েন ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে জ্ঞান হারান। উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও মৃতের দেশে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সাথে অচিরেই তিনিও যোগ দিলেন। এই আত্মোৎসর্গ নিছক বীরত্বের প্রদর্শন নয়, এটি একজন শিক্ষকের পেশাগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মমত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মাহরিন চৌধুরীর এই আত্মোৎসর্গ কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া তাৎক্ষণিক সাহসিকতার প্রকাশ নয়; বরং এটি ছিল দীর্ঘ সময় ধরে তার চেতনায় নির্মিত এক অটল বিশ্বাস, পেশাগত নৈতিকতা ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের নীরব প্রশিক্ষণ থেকে উৎসারিত। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি শুধু পাঠদানের মাধ্যমে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেভাবে দায়িত্বশীলতা ও মমতার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা-ই তাকে দিয়েছিল অনন্য শিক্ষকের গৌরভ। প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তার পেশাগত প্রতিশ্রুতি ও মানবিকতা যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা কোনো রূপকথার গল্প নয়। বরং বাস্তবতার নির্মমতা ভেদ করে সেটি আমাদের মনে উঁকি দেয় এক অসাধারণ শিক্ষকের নৈতিক শক্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে যখন অন্যেরা নিজেদের রক্ষায় প্রাণপণ ছুটছিলেন, তখন মাহরিন চৌধুরী ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের হাত ধরে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন নিজের প্রাণ বাজী রেখে। ওই মুহূর্তে তিনি কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন আশ্রয়, সাহস, ভালোবাসা ও করুণার মূর্ত প্রতীক। তার চোখে ছিল না আতঙ্কের ছাপ, ছিল মাতৃস্নেহের দৃঢ়তা ও ভালোবাসার আকুতি; তার কণ্ঠে ছিল না আর্তনাদ, ছিল দায়িত্বের দায়ভার। সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত যেখানে একজন শিক্ষক হয়ে ওঠেন অভিভাবক, বীরযোদ্ধা ও মুক্তির আশ্বাস।

এমন শিক্ষকরা শুধু শ্রেণিকক্ষেই জ্ঞানের আলো জ্বালান না, বরং জীবনের সংকট মুহূর্তে তাদের উপস্থিতিই হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের জন্য বাঁচার ইচ্ছা, ভরসা এবং ভবিষ্যতের দিশা। তার দেহ হয়তো পুড়ে গেছে, তিনি পেরিয়ে গেছেন জীবন নদীর ওপারে। কিন্তু আগুনের সেই ভয়ঙ্কর শিখাও স্পর্শ করতে পারেনি তার আদর্শ, ভালোবাসা কিংবা মানসিক দৃঢ়তাকে। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন একজন শিক্ষক কেবল পাঠদান করেন না,

প্রয়োজনে তিনি প্রাণ দিয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

মাহরিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষকতা কেবল একটি পেশাগত পরিচয় নয়; এটি এক অবিচল নৈতিক প্রতিশ্রুতি। ফলে বিপদের মুখেও একজন আদর্শ শিক্ষক পশ্চাদপসরণ করে না। তার এই আত্মাহুতি আমাদের চোখে জাগায় এক নতুন বোধ ও শ্রদ্ধা যেখানে শিক্ষকতা আর পেশা থাকে না, তা পরিণত হয় এক পবিত্র মানবিক দায়িত্বে। তার কর্মময় জীবন আমাদেরকে শেখায় যে, একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল শেখান না, ভালোবাসেন, আগলে রাখেন, সাহস জোগান এবং প্রয়োজনে নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষাকর্ত্রী হয়ে ওঠেন। আমরা সত্যিই একজন আলোকিত মানুষকে হারিয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তার সঞ্চারিত আত্মোৎসর্গের আলো আমাদের অনেককে জাগিয়ে দিবে এবং শিক্ষকতার মহান আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আলোর মশাল হাতে আগামীর প্রজন্মকে পথ দেখাতে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নিজ গ্রামের শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় গড়ার, যেখানে প্রতিটি মুখে ফুটবে জ্ঞানের হাসি, বিকশিত হবে সম্ভাবনার আলো। তার জীবনের দর্শন, মূল্যবোধ ও কাজের মধ্যেই এই স্বপ্নের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা কেবল শহরের সুবিধাভোগী মানুষদের একচেটিয়া অধিকার নয় গ্রামের পিছিয়ে পড়া শিশুরাও সম্মানের সঙ্গে ভালো শিক্ষার সুযোগ পাওয়া উচিত।

ঘনিষ্ঠজনদের মতে তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘একদিন আমি আমার গ্রামের শিশুদের জন্য এমন একটা স্কুল করব, যেখানে তারা ভালো শিক্ষক পাবে, ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠবে’। তার স্বপ্ন ছিল একটি মানবিক, নৈতিক এবং মুক্তচিন্তার ভিত্তিতে নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান, মমতা ও ন্যায়ের চর্চা হবে।

এটি নিছক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন ছিল না, ছিল সমাজ পরিবর্তনেরও এক নীরব বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা। তাই মাহরিন চৌধুরীর স্বপ্ন, তার কর্ম এবং তার আত্মত্যাগ এক সুতোয় গাঁথা যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বৈষম্যমুক্ত শিক্ষার সুযোগ অবারিত করতে নতুন করে ভাবতে। এমন

মানুষদের প্রকৃত অর্থে মৃত্যু হয় না। তারা থেকে যান আলোর মতো, বাতাসের মতো, নীরব অথচ স্পষ্ট এক অদৃশ্য উপস্থিতিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান / ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই'। মাহরিন চৌধুরী সেই নিঃশেষ আত্মদানকারী যাঁর জীবনের দীপ্তি আমাদের অন্তর ও জাতিগত আদর্শিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবে অনাগত দিনগুলোতেও।

মাহরিন চৌধুরীর আত্মত্যাগকে যদি আমরা কেবল একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখি, তবে আমরা তার ত্যাগের মহত্ত্বকে খাটো করব, তার মর্যাদার প্রতি অবিচার করব এবং তার স্মৃতির প্রতি গভীর অন্যায় করব। এই দুর্ঘটনাটি কেবল শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা অভিভাবকের মৃত্যুর শোক নয়, বরং এটি জাতি হিসেবে আমাদের নৈতিক চেতনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ জাগরণ-মুহূর্ত। এ ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা মানে শুধু ভবন কোড মেনে নির্মাণ নয়, বরং তা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবার জন্য নিরাপদ, সহানুভূতিশীল এবং দায়িত্বশীল পরিবেশ নিশ্চিত করাকে বোঝায়। এটি আমাদের সরকারি প্রশাসনের সুশাসন, রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনার বাস্তবতা, সামরিক ও বেসামরিক নিরাপত্তা প্রটোকলের কার্যকারিতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক ভিতকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ফলে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে ভবিষ্যতের জন্য জবাবদিহির দরজা খুলে দিতে।

মাহরিন চৌধুরীর দৃষ্টান্ত আমাদের একটি কঠিন সত্য শেখায়। আর সেটি হলো, শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি নৈতিক ব্রত, যা জীবনের চরমতম মুহূর্তেও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয় না। সুতরাং তাকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তবে আমাদের প্রয়োজন জাতির জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শ্রেণিকক্ষ হবে কেবল পাঠদানের স্থান নয়, বরং মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা এবং আত্মত্যাগ শেখার এক অনন্য চর্চাকেন্দ্র। যেখানে শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল পাঠদান নয়, নিজ নিজ আচার-আচরণে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টান্ত। যেখানে একজন শিক্ষক ভয়, অবহেলা ও কর্তৃত্ব দিয়ে নয়, বরং ভালোবাসা,

পেশাগত সচেতনতা ও নৈতিক দায়বদ্ধতাই দিয়েই ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ হিসেবে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন।

‘মাহরিন চৌধুরী আর নেই’- এই বাক্যটি যেমন শোকাবহ ও করুণ, তেমনি এক নির্দয় সত্যের ভাষ্য। তবে একই সঙ্গে এটি সামগ্রিক সত্যের অপলাপ। কারণ মৃত্যুর রাজপথে তিনি নিরুদ্দেশ হননি, তিনি আছেন তার ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের অন্তর্গত সাহস ও মানবিক চেতনায়, সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভরা ও আবেগময় স্মৃতিতে, নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করা সেই শিশুদের বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ চোখে। তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের জাতিগত বিবেকের জাগরণ ও প্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসেবে, ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের পেশাগত নৈতিক দায় ও অনুপ্রেরণায় এবং শিক্ষা ও ন্যায়বোধের সংগ্রামে এক কালজয়ী চেতনারূপে ইতিহাসের দর্পণে। ফলে তিনি রয়ে যাবেন জাতির সামষ্টিক স্মৃতিতে, যেখানে আত্মত্যাগের এক অনন্ত স্মারক হয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন অনাগত কালেও। তার এ আত্মত্যাগ একক কোনো ব্যক্তির ঘটনা নয়, এটি একটি জাতির স্মৃতিতে লেখা হয়ে যাওয়া এক অনন্ত প্রতিশ্রুতি যেখানে শিক্ষা হবে দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা হবে সাহসিকতায় পূর্ণ এবং শিক্ষকতা হবে নৈতিক দায়তাড়িত এমনকি জীবনের প্রয়োজনে আত্মদানেও প্রস্তুত। তার নাম কেবল কোনো পাথরের ফলকে নয়, অম্লান থাকুক আমাদের চিন্তাচেতনায়, অনুভবে, ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, শিক্ষায় এবং রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামোয়। সোনার হরফে লেখা তার নাম খোদিত থাকুক জাতীয় চেতনার প্রাচীরে, দেশের শিক্ষকদের প্রতিটি উচ্চারণে, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি স্বপ্নে এবং একটি জবাবদিহিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সরকারের নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রতিটি অঙ্গীকারে।

[লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য]